কবি প্রণাম

হাতে খড়ি

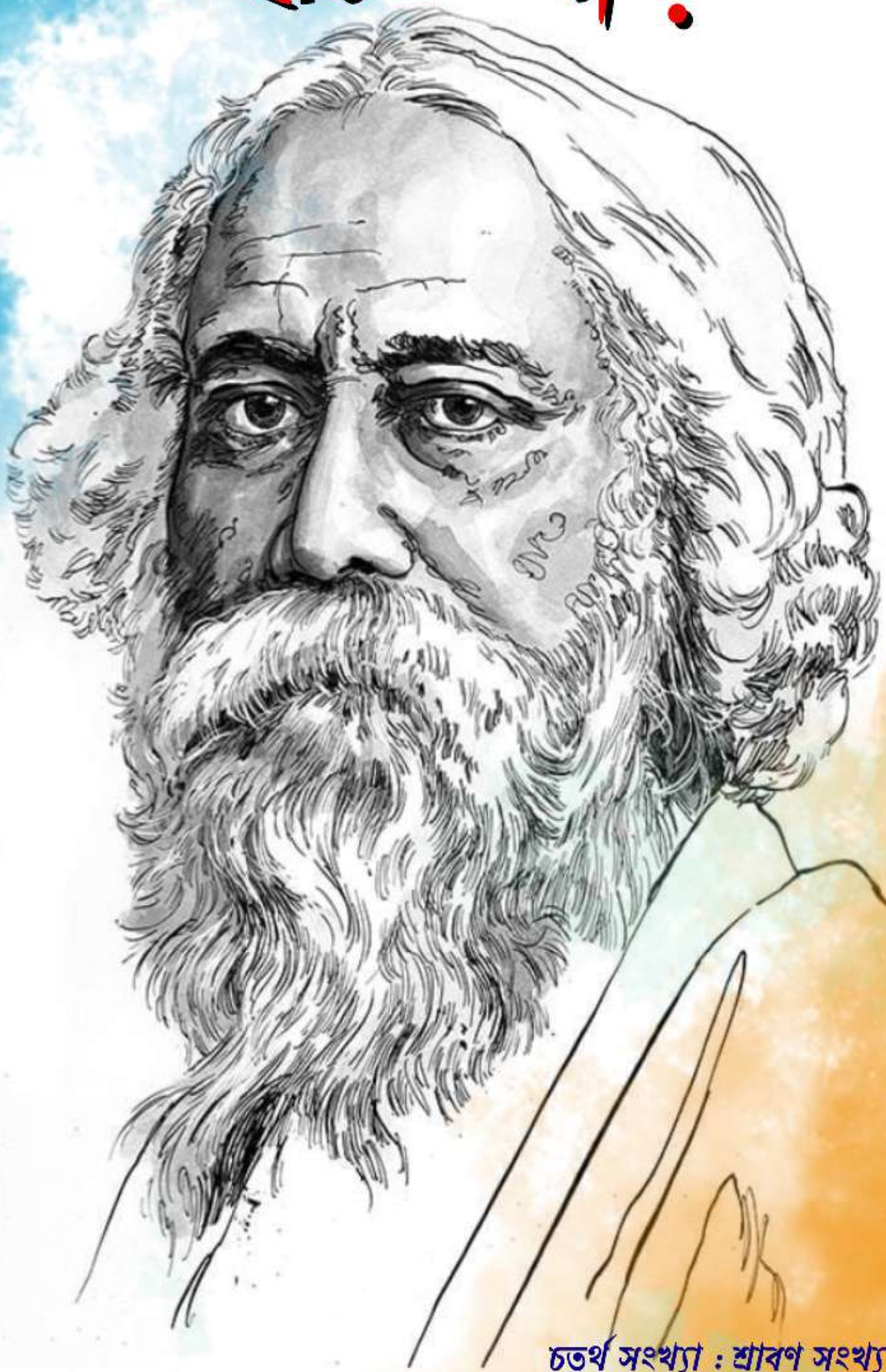

চতুর্থ সংখ্যা : শ্রাবণ সংখ্যা ১৪২৯

লহ প্রণাম

সম্পাদকীয়

সম্পাদিকার কলমে,

শ্রাবণ এবার চোখটি মোছো রবির কষ্টে না কেঁদে,

তিনি তো আছেনই লেখায়,গানে অমরত্বের সূত্র বেঁধে ।

আজ থেকে প্রায় ৮১বছর আগে ২২শে শ্রাবণ আমাদের প্রাণের প্রিয় বিশ্বকবি রবিঠাকুর বিশ্ববাসীকে কাঁদিয়ে নাম না জানা এক অন্য বিশ্বে পাড়ি দিয়েছিলেন।

আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮১তম প্রয়াণ দিবস। মহাকালের চেনাপথ ধরে প্রতিবছর বাইশে শ্রাবণ আসে। এই বাইশে শ্রাবণ বিশ্বব্যাপী রবি ভক্তদের কাছে একটি শূন্য দিন। কাব্যে মৃত্যু এসেছে বিভিন্নভাবে। জীবদ্দশায় মৃত্যুকে তিনি জয় করেছেন বারবার।

জীবনের শেষ নববর্ষের সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সাধের শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের শেষ দিনগুলোতে কখনও তিনি শয্যাশায়ী, কখনও মন্দের ভালো। ৯ শ্রাবণ (২৫ জুলাই) শান্তিনিকেতন থেকে কবিকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হলো। শান্তি নিকেতনের সাথে কবির ৭০ বছরের স্মৃতি জড়িত।

কবি কি বুঝতে পেরেছিলেন এই তাঁর শেষ যাত্রা? যাবার সময় ওনাকে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে দেখা গেছে।

রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসেন না এমন বাঙালির দেখা মেলা ভার। আসলে কবিগুরু যে আমাদের রক্তে, আমাদের অন্তরে, আমাদের হৃদয় সিংহাসনে বিরাজমান। সেই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কিছু লিখতে চাওয়া এক মস্ত বড় ব্যাপার। কিন্তু আমাদের 'হাতেখড়ি' পত্রিকার লেখালেখির ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা হয়নি, কারণ ওজনদার শব্দসমষ্টিতে লেখালেখি আমাদের এই পত্রিকার উদ্দেশ্য নয়, বরং ২২শে শ্রাবণ দিনটিকে স্মরণ করে প্রাণের রবিঠাকুরকে নিয়ে মনের অনুভূতি প্রকাশের প্রচেষ্টা মাত্র।

আজ ২২শে শ্রাবণ,

কবিপক্ষের শেষলগ্নে কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস কে স্মরণে রেখে কবিকে প্রণাম জানিয়ে আমরা আমাদের "হাতে খড়ি" পত্রিকার "চতুর্থ সংখ্যা" প্রকাশ করলাম। আমাদের সহপাঠীরা,প্রাক্তনী দিদিরা ও বোনেরা নিজেদের মতো করে তাদের সুন্দর ভাবনাগুলোকে এই পত্রিকায় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে।কিছু কারণ বশত আমাদের এবারের পত্রিকার লেখালেখি গতবারের সংখ্যা গুলির তুলনায় স্বল্প হয়েছে,তার জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। এছাড়াও পত্রিকায় লেখার মাঝে কিছু ভুল ত্রুটি হয়তো থাকতে পারে তাই পরবর্তী সংখ্যার পত্রিকাগুলোকে আমরা আরো পরিণত করার প্রতিজ্ঞা করলাম।

পরিশেষে সম্মাননীয়া অধ্যক্ষা ড. রুপালী চৌধুরী মহাশয়াকে ও আমাদের বিভাগীয় সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এবং বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপিকা ড. পিয়ালী দত্ত চৌধুরী মহাশয়াকে, যাঁর অনুপ্রেরণায় আমাদের "হাতে খড়ি" পত্রিকার যাত্রা শুরু হয়েছিল, এবং তাঁরই সাহচর্যে আমরা এইবারের পত্রিকা প্রকাশে ব্রতী হয়েছি। এছাড়া পত্রিকার প্রচ্ছদ নির্মাতা, আলঙ্কারিক ও সাহায্যকারী দের জানাই আন্তরিক ভালোবাসা। এবং অবশ্যই আমাদের সহপাঠীদের, প্রাক্তনী দিদিদের ও কনিষ্ঠাদেরও অনেক স্নেহ ও ভালোবাসা জানাই তাদের অমূল্য কাজগুলি দিয়ে আমাদের পত্রিকাটির পাশে থাকার জন্য। আর পাঠক বৃন্দকেও জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। কারণ পাঠক ব্যতীত আমাদের এই পত্রিকা মূল্যহীন।

সকলে পাশে থাকবেন,সঙ্গে থাকবেন।

সকলের শুভকামনাই আমাদের একান্ত কাম্য।

-ধন্যবাদান্তে

সম্পাদক (হাতে খড়ি)

মন্দিরা বসাক

সহসম্পাদক (হাতে খড়ি)

আলিশা নাসরিন

বাংলা বিভাগ (পঞ্চম সেমিস্টার)

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন : বাংলা বিভাগ

চতুর্থ সংখ্যা : শ্রাবণ সংখ্যা ১৪২৯

প্রকাশ : ৮ই আগস্ট,২০২২

সম্পাদক

মন্দিরা বসাক (পঞ্চম সেমিস্টার)

সহসম্পাদক

আলিশা নাসরিন (পঞ্চম সেমিস্টার)

সহায়তাকারী

হেতু বর্মন , অনুষ্কা দাস (তৃতীয় সেমিস্টার)

সম্পূর্ণ অলঙ্করণে

প্রীতি গিরি (পঞ্চম সেমিস্টার)

প্রচ্ছদ নির্মাণে

সুলগ্না দে (পঞ্চম সেমিস্টার)

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

১. আমার প্রাণের কবি - প্রিয় রবি > আলিশা নাসরিন ১

ছোটগল্প

১. সময়ের ওঠা নামা > তৃষা চক্রবর্তী ৩

২. বন্ধুত্ব > তৃষা চক্রবর্তী ৪

অণুগল্প

১. কাঁটা > প্রীতিষা মাইতি ৫

২. বর্ষা আমাদের প্রাণ > পিয়ালী দাস ৬

কবিতা

১. নিবেদন > অমিশা ভাওয়াল ৭

২. হে কবিগুরু > পিয়ালী দাস ৮

অনুকবিতা

১. শুধুই রবি > তৃষা চক্রবর্তী ১০

২. কবি তুমি > পৃথা সেন ১১

৩. দুই প্রিয় > আলিশা নাসরিন ১২

৪. আমিও পেয়েছি > পৃথা সেন ১৩

খোলাচিঠি

১. শ্রী চরনেষু মা > তৃষা চক্রবর্তী ১৪

শান্তিনিকেতন ও ভ্রমণ সাহিত্য

১. রবির দেশে > তৃষা চক্রবর্তী ১৬

২. শান্তিনিকেতন স্মৃতিচারণ > প্রীতিষা মাইতি ১৮

আঁকিবুঁকি

১. শ্রেয়া ব্যানার্জী ২০

২. শ্রেয়া দে ২১

৩. সাগরিকা সাহা ২২

৪. তৃষা চক্রবর্তী ২৩

৫. সুলগ্না দে ২৪

৬. ঐশী সিংহ ২৫

ফটোগ্রাফি

১. প্রীতিষা মাইতি ২৬

২. পূজা দাস ২৭

৩. অপর্না পাল ২৮

৪. পিয়ালী দাস ২৯

৫. মন্দিরা বসাক ৩০

৬. প্রীতিষা মাইতি ৩১

৭. আলিশা নাসরিন ৩২

৮. হেতু বর্মন ৩৩

৯. সাগরিকা সাহা ৩৪

১০. অঙ্কিতা বিশ্বাস ৩৫

১১. মন্দিরা বসাক ৩৬

১২. প্রীতিষা মাইতি ৩৭

১৩. হেতু বর্মন ৩৮

১৪. সাগরিকা সাহা ৩৯

১৫. শর্মিতা দত্ত ৪০

প্রবন্ধ

আমার প্রাণের কবি -প্রিয় রবি

"এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি"

এই বাণী শুধু সুকান্তের নয় এই বাণী আমাদেরও অন্তরের বাণী।

সময় বদলায়,আধুনিকতা থেকে উত্তর আধুনিকথায় যাত্রা করে সময়,তারপরেও যার প্রাসঙ্গিকতা বঙ্গজীবনের অঙ্গ হয়ে থেকে যায় তিনিই আমাদের সকলের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্মের ১৬১বছর পরেও সেই কবিকে আজকের কবি বলে মনে করেন একালের কবিরাও।যে কাব্যই লিখি, যে গানই শুনি, বা যে ছবিই দেখি না কেন, কেবলই মনে হতে থাকে, এই সবকিছুই রবীন্দ্রনাথ আগেই বলে গেছেন। মৌলিক কিছু নেই। তিনি এক মহাকাশ। যে মহাকাশে অগণ্য জ্যোতিষ্ক, নক্ষত্র বা ছায়াপথ। সৌরজগতে দাঁড়িয়ে যেমন সূর্যকে অস্বীকার করা যায়না, বাংলা ভাষা সংস্কৃতির চেতনায় দাঁড়িয়ে তেমনই অনস্বীকার্য এই মানুষটি।

রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব শক্তির বিকাশ ঘটেছিল অতি শৈশবকাল থেকে।আট বছর বয়সেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। ১৮৭৪ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-এ তার “অভিলাষ” কবিতাটি প্রকাশিত হয়। আর এটিই ছিল তার প্রথম প্রকাশিত রচনা। ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের “ভিখারিণী” গল্পটি, যা বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ “কবিকাহিনী”।রবি ঠাকুর দুই হাজারেরও বেশি গান রচনা করেছিলেন।রবীন্দ্রনাথের ৫২টি কাব্যগ্রন্থ, ৩৮টি নাটক, ১৩টি উপন্যাস , ৩৬টি প্রবন্ধ তার জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। তার সর্বমোট ৯৫টি ছোটগল্প গল্পগুচ্ছ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা ৩২ খণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলী নামে প্রকাশিত হয়েছে।আর তাঁর যাবতীয় পত্রসাহিত্য উনিশ খণ্ডে এবং এছাড়াও চারটি পৃথক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি প্রায় দুই হাজার ছবি-ও এঁকেছিলেন।

তিনি একাই বাংলা সাহিত্যে যত রচনা করেছেন, তা একজনের মানুষের এক জীবনে পড়ে শেষ করাই দুরূহ!১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তার এই কবি-প্রতিভা বিশ্বসভায় স্বীকৃতি পায় এবং তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশ্বজুড়ে অঢেল সম্মানও পান। দেশে দেশে তাঁর কাব্যের ও সাহিত্যের অনুবাদ শুরু হয়ে যায়, যা আজও অব্যাহত।

কেবল কবি নন, ব্যক্তি হিসাবেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। তিনি নিজে গান গাইতে পারতেন এবং ছিলেন খুব উঁচুদরের চিত্রশিল্পী। তার স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশানুরাগ এতই গভীর ছিল যে, তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করার কথা জানান। ভারত এর জাতীয় সংগীত 'জনগণমন -অধিনায়ক জয় হে' এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' তিনিই রচনা করেছিলেন।

কবি যে দেশেই গেছেন সেখানেই প্রচার করেছেন শান্তির বাণী। দেশবাসীকে যথার্থ পরিবেশে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি বোলপুরের কাছে প্রতিষ্ঠা করেন, শান্তিনিকেতন'। বিশ্বভারতী’ছিল তার আদর্শে তৈরি একটি অনুপম শিক্ষায়তন।

আজ তিনি বাঙালির হৃদয়ের এমন স্থানে আছেন, যেখান থেকে তাঁকে টলানো অসম্ভব। সকল শুভ কাজের শুরুতে, সকল উৎসবের প্রাক্কালে তিনি আছেন, তিনি ছাড়া বাঙালিয়ানা যে অসম্পূর্ণ!তিনিই বাঙালির জীবনের ধ্রুবতারা, তিনিই কণর্ধার! হাসিকান্নার মাঝে ভেসে আসে তাঁর গানের ভেলা,ঋতুর আগমনে মুগ্ধ

প্রানে বাজে তাঁর বাঁশির সুর। বিদ্রোহে চাই তাঁর কবিতার শক্তি, প্রেমে চাই তাঁর-ই রচিত আকুলতা! তিনিই যে আমাদের আবেগ-অনুভবের পরিপূরক!

প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পেরিয়ে গেলেও এই রবি ঠাকুরের প্রতি একটি প্রাণের প্রণাম তাই থেকেই যায়!

"জগৎ কবির সভায় মোরা আজিকে করি গর্ব,

বাঙালি আজি গানের রাজা, বাঙালি নহে খর্ব ।"

আলিশা নাসরিন

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

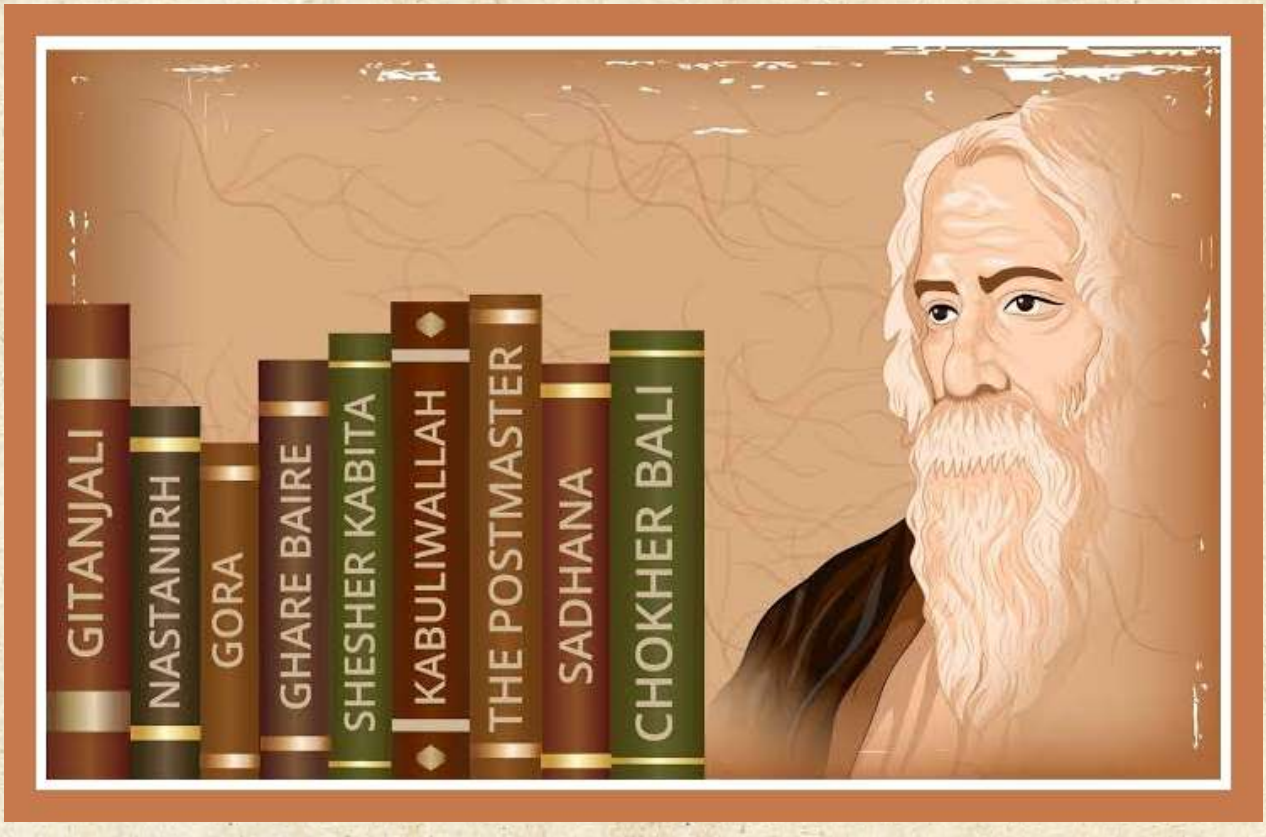

ছোটগল্প

সময়ের ওঠা নামা

উত্তরা রোজ এই লোকাল ট্রেনে চেপে কাজে যায়। দমদম থেকে শিয়ালদহ। সকাল ৯ টার সময় এই লোকালে ওঠা রোজ রীতিমত একপ্রকারের ঠান্ডা যুদ্ধ তার কাছে। তারপর ট্রেনে কোনোভাবে উঠে ভেতরে দাঁড়াতে পারলে আর একপ্রকার যুদ্ধই বলা যায়। লেডিস কম্পার্টমেন্টে ওঠার দরুণ মোটামুটি গল্পটা খানিকটা এরকম- "আরে আপনি একটু ঠিক করে কাঁধের ব্যাগ টা সরিয়ে দাঁড়ান না", "একটু চেপে বসুন ওই তো জায়গা আছে অনেক", "দিদি আপনি কোথায় নামবেন তাহলে আপনার জায়গাটায় আমি বসবো", "এই দেখি হাতটা সরান, ঠিক করে দাঁড়াতেও পারেনা" ইত্যাদি প্রভৃতি। যাই হোক এরপর নামার সময় চলে আরেকপ্রকার গল্প। "ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক ট্রেন থামলেই ঝাঁপ দেবে তার আগের প্রস্তুতি", "হেডফোনে গানের দুনিয়ায় ভেসে থাকা যেনো ট্রেন না থামলেই ভালো", "তাড়াতাড়ি নামুন" ইত্যাদি প্রভৃতি। যাই হোক এই করে নামা হলো। তারপর সেখান থেকে দৌড়ে দৌড়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে অটোর লাইনে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি অটো ধরে ১০:৩০ টার মধ্যে অফিসে ঢোকে উত্তরা। ঢুকেই বসের কাজ বুঝিয়ে দেওয়া এবং একেবারে তারপর টিফিন ব্রেক। প্রায় সকাল থেকে যুদ্ধের পর একটু বিরতি ২০ মিনিটের। তারপর আবার কাজে ডুবে যাওয়া ও সন্ধ্যে ৭টায় কাজ থেকে অবসর দিয়ে আবার একই ভাবে বাড়ি ফেরা। বাড়ি ফেরে যখন তখন একরাশ বিরক্তি। ফ্রেশ হয়ে খেয়ে আর মাকে খাইয়ে দিয়ে বিছানায় শরীর টা ফেলে দেয়। আগে বলা হয়নি, আসলে উত্তরার বাড়িতে উত্তরা আর ওর মাকে নিয়ে ওদের দুজনের ছোট্ট পরিবার। খুব ছোট বেলায় উত্তরা তার বাবা কে হারায় আর তারপর থেকে মা আর মেয়ের পরিবার। সে যাই হোক অফিস থেকে এসে উত্তরার আর কোনও শক্তি থাকেনা তার যে একটু মায়ের সাথে কথা বলবে একমাত্র রবিবার ছাড়া। জয়িতাদি চলে গেছে হাতের কাজ সেরে। যে সময়টা উত্তরা থাকেনা সে সময়টা জয়িতাদি ওর মাকে দেখে রাখে, ওর মায়ের সাথে অনেক গল্প করে তারপর সন্ধ্যের কাজ করে রাতের রান্না করে দিয়ে বাড়ি চলে যায় রাত ৮টার লোকাল ধরে। ওর একটা ছোট মেয়ে আছে, সবে সে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে পাড়ার এক স্কুলে। সে রোজ অপেক্ষা করে থাকে তার মা আসবে আর রাতে খাইয়ে দেবে। মা যখন ঘরে ঢোকে তখন এক ছুটে এসে সে মাকে জড়িয়ে ধরে আর ঠিক তখনই সারাদিনের সব ক্লান্তি জয়িতার এক নিমেষে মুছে যায়। সে যত রাতই হোক জয়িতা জানে আর কেউ না থাকুক মেয়ে তার জন্য জেগে বসে থাকবেই। তারপর রাতে খেয়ে নিয়ে যখন ঘুমোতে যাবে তখন বিভিন্ন রকমের গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বে এই অপেক্ষাটা এক অন্যরকমের শান্তি, ভালোবাসার আশ্বাস দেয় সারাদিনের পর মা মেয়ে দুজনের জন্য। হয়তো অনেক অভাব আছে, কাজের ক্লান্তি আছে কিন্তু মা-মেয়ের এই জগতে দুজনের জন্য সময় আছে, ভালোবাসা আছে, ভরসা আছে, যেটা হয়তো সচ্ছল অবস্থা, কংক্রিটের বাড়িতেও অভাব হয়ে পড়ে । তাই ফ্ল্যাটের মজবুত সুরক্ষিত বাড়িতে উত্তরা আর ওর মায়ের জমানো কথা গুলো মনেই থেকে যায় তা আর বলা হয়না। কথায় বলে, "সময় বয়ে চলে নদীর মতো"। সাথে সম্পর্কের ব্যবধান গুলো অজান্তে বেড়ে চলে। অজান্তেই উত্তরা আর তার মায়ের মধ্যে সম্পর্কের একটা নীরব ব্যবধান বয়ে যায় নদীর মতো সময়ের অভাবে।

তৃষা চক্রবর্তী

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

বন্ধুত্ব

প্রমিতা স্কুলে রোজ ঝগড়া করে। বাবা মা এর কথামত একপ্রকার জোর করেই স্কুল যায়। কিন্তু স্কুল যাওয়া তার একেবারেই অপছন্দের একটা বিষয়। যথারীতি স্কুলে গিয়ে শাস্তি রোজের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়ের এমন কান্ড শুনে বাবা মা ও অস্থির। তারা যেহেতু দুজনেই কর্ম জগতে যুক্ত তাই বাড়িতে তেমন সময় পায়না রাত ও সকালটুকু ছাড়া। কিছুতেই তারা ঠাওর করতে পারছেনা প্রমিতার কোথায় অসুবিধা হচ্ছে। কিছু জিজ্ঞেস করলেই খিটখিটে মেজাজে কথা বলে। স্কুলে রোজ যায় বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করে অনেকসময় হাতাহাতিতে গেলে স্টাফ রুম থেকে শিক্ষিকাদের এসে সেই ঝগড়া থামাতে হয়। এর জন্য প্রমিতার সাথে তার সহপাঠীরাও কেউ কথা বলতে চায়না,, দূরে দূরে থাকে। যথারীতি পরীক্ষা শেষে নতুন ক্লাস শুরু হলো। একজন নতুন মেয়ে প্রমিতাদের বিভাগে এলো। সে খুব কথা বলে,,, চটপট প্রত্যেক শিক্ষিকাদের পড়ার উত্তর দেয়,, সব বন্ধুদের সাথে খুব গল্প করে। এই দেখে প্রমিতার রাগ হয়, সে আস্তে আস্তে আরো মনমরা হয়ে গেলো,, বাড়িতে তেমন আর কথা বলেনা, স্কুলে টিফিন খায়না। এসব সবাই লক্ষ্য করে স্কুলে কিন্তু কেউ কিচ্ছু বলেনা পাছে প্রমিতা আবার ঝগড়া শুরু করে এই ভয়ে সবাই চুপ থাকে। পৃথা অর্থাৎ বিভাগে যে নতুন মেয়েটি এসছে সে একদিন টিফিন বেলায় এসে প্রমিতার পাশে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে। পৃথাই নীরবতা ভেঙ্গে বলে, "চলো টিফিন টা তাহলে শুরু করি?" প্রমিতা বলে, "আমার ভালো লাগছেনা, আমি খাবোনা।" পৃথা বলে,"বেশ খেওনা। তবে তোমায় একটা জিনিস দেওয়ার ছিল।" প্রমিতা আগ্রহ ভরে এবার জিজ্ঞেস করে,"কি?" পৃথা বলে, "ওরকম ভাবে তো দেওয়া যাবেনা তার জন্য চোখ বন্ধ করতে হবে। মুখ এর হাঁ টা বড়ো করতে হবে তবেই পাওয়া যাবে উপহার।" প্রমিতা ভাবলো এটা আবার কীরকম তাও বিরক্তি নিয়েই হাঁ করলো কথামত। পৃথা এই সুযোগে প্রমিতার মায়ের বানানো লুচি আর আলুর টুকরোটা মুখে ভরে দিলো। প্রমিতা রাগে গজগজ করতে করতে বলে, "এটা কি হলো?" পৃথাও সাথে সাথে বলে, "উপহার দিলাম। তোমার পছন্দ হয়নি এই উপহারটা?" প্রমিতা মুখের খাবারটা শেষ করে বললো, "এই যে আমি রোজ ঝামেলা করি সবার সাথে তোমার খারাপ লাগেনা? তারপরেও তুমি আমার সাথে কথা বলতে এলে? আমাকে জোর করে খাইয়ে দিলে? কেনো?" পৃথা তখন বললো, "সব মানুষের মধ্যে যেমন খারাপ থাকে তেমন ভালো থাকে। তোমার খারাপের পিছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে সেটা আমার জানার বিষয় নয় তবে তোমার যে এই ভালো গুনটাও আছে সেটা তো কেউ জানেনা। এই যে তোমার চোখে জল। আমি তোমার ভালো স্বভাবটাকে সামনে আনার চেষ্টা করেছি মাত্র।" এই বলে পৃথা তার বন্ধুর দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, "তাহলে আমরা কি বন্ধু হতে পারি?" প্রমিতাও হাত টা দিয়ে শুধু বললো, "হ্যাঁ।" এরপর থেকে এক নতুন বন্ধুত্বের সূচনা হলো। সাক্ষী হয়ে রইলো ওদের ক্লাসরুম, বেঞ্চ, টিফিন বক্স আর ওরা দুজন।

তৃষা চক্রবর্তী

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

অণুগল্প

কাঁটা

সামন্তপাড়ার ঠিক শেষপ্রান্তের তিনতলা বাড়িটার নিচের তলার ঘরটায় সেই সকাল থেকে অনবরত কৃষ্ণনাম জপ করে চলেছে কীর্তনীয়ার দল। কৃষ্ণভক্ত চন্দ্রিকা দেবী তা যেন আজ সহ্যই করতে পারছেন না। দু হাতে কান দুটোকে চেপে ধরে তিনতলার সবচেয়ে কোণের ঘরটায় বসে আছেন তিনি। তার যেন আজ এই কৃষ্ণনাম শুনতে একপ্রকার বিরক্তই লাগছে।...

ওই কৃষ্ণনাম কানে আসতেই তার মনে পড়ে যাচ্ছে সেই দিনগুলোর কথা।...সঞ্জয় দরজা বন্ধ করে তার প্রিয় হোম থিয়েটারটায় তারস্বরে হিপহপ গান চালিয়ে রেখেছে আর ল্যাপটপে গেম খেলছে। চন্দ্রিকা দেবী কাজের মাঝে মাঝে আসছেন, দরজা ধাক্কা দিয়ে ছেলেকে সেই গান কমাতে বলে আবার নিজের কাজে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছেন। কখনও তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন " সঞ্জু, সামনে তোর ইঞ্জিনিয়ারিং ফোর্থ ইয়ার ফাইনাল। মনে আছে তো!" আবার কখনও ভয় দেখাচ্ছেন " বাবাকে বলবো এবার তোর ওয়াইফাই রিচার্জ টা আর না করতে। কিভাবে গান চালাবি এতো, দেখবো!" আবার কখনো "লোকে কি বলবে" এই অজুহাত দিয়ে তা বন্ধ করতে নয় কমাতে বলছেন। প্রায় প্রতিদিনই পাড়ার লোকেরা শুনতে পেত তাদের এই ঝামেলা। ঠিক ঝামেলা নয়। মা ছেলের রোজকার কাহন বলা যেতে পারে। ছেলেটা কিন্তু গান শুনতে সত্যি খুব ভালোবাসে....ঠিক এমন এক স্মৃতিচারণ করতে করতে দো তলার ঘর থেকে হটাৎ দুটো কথা কাঁটার মত এসে চন্দ্রিকার কান থেকে প্রবেশ করে বিধে গেল তার মনে, মস্তিষ্কে, সারা শরীরে...." স্বর্গীয় সঞ্জয় সামন্ত পিন্ড দানেশই নমঃ"....চন্দ্রিকা দেবীর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো...চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো অনর্গল জলধারা। বিড়বিড় করে বলে উঠলেন..ভালোবাসতো...

প্রীতিষা মাইতি

(প্রাক্তনী)

বাংলা বিভাগ

বর্ষা আমাদের প্রাণ

' কি রে বীরু আর কি বৃষ্টি হবে না ? ' গ্রামের বৃদ্ধ আব্দুল চাচার প্রশ্নে কি জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারল না বীরু। তার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন চিন্তায় । কিছুদিন আগে গ্রামের সুদখোর মহাজন রমাকান্ত দত্তের কাছ থেকে বেশ কয়েকহাজার টাকা ধার নিয়ে বোনের বিয়ে দিয়েছে। ভেবেছিল ধান চাষ করে সমস্ত ধার শোধ করবে। কিন্তু একমাস হল কোন বৃষ্টি নেই । মাটি রৌদ্রে শুকিয়ে ফেটে গেছে। নদী ,পুকুরগুলোও শুকনো।

চাতক পাখির মতো পুরো গ্রাম তাকিয়ে আকাশের দিকে ।

বীরু মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে যায় । ছুটে যায় । আজ গরমটা একটু বেশিই পড়েছে। হবে না সে কোলকাতা ফেরত কাকার কাছে শুনেছে , কোলকাতায় গাছেদের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। রাগে ঘড়ে গিয়ে নারকেল দড়ি নিয়ে ভিতরে ফাঁসি দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে ।

মনে মনে গাল পাড়ে বৃষ্টিকে , নিদারুণ ভাগ্যকে।

ঝুলে পড়তে যাবে

ঠিক এমন সময় গ্রামে লোকদের চিৎকার তার কানে এসে পৌছাল ।

'দরজা খোল বীরু ।'

গলাটা পচার । একরাশ বিরক্তি নিয়ে ফাঁসির প্রস্তুতি ত্যাগ করে দরজা খোলে ।

- ' কি হয়েছে? '

- ' আকাশের দিকে চেয়ে দেখ ' ।

আকাশের দিকে চাইতেই মনটা নেচে উঠল বীরুর । গ্রামের সবার সাথে সেও ছুটল । বৃষ্টি হবে আজ । আকাশ কালো করে এসেছে । নিমেষে সে ভুলে গেল তাকে মরতে হবে। আবার নতুন করে নব বর্ষণের আগমনের সাথে সবার সাথে বাঁচতে হবে যে । সবার মতো কষ্ট করে আবার ফলাবে ধান। আকাশ থেকে তখন শুরু হয়েছে গ্রামের চাষীদের জন্য দেবতার আশীর্বাদ - বৃষ্টি। ফেঁটে যাওয়া মাটি জল পান করে জেগে উঠবে । ফলবে সোনার ফসল ।

গ্রামের বাউল ভিজতে ভিজতে গাইছে -

"ধান, মাটির প্রাণ হল বর্ষা ।

বর্ষা কৃষকের ভরসা।।

কখনো কারোর মাথার ছাদ ভাঙে , কখনো তা আবার গড়ে ।

বর্ষা আমাদের প্রাণ "।

পিয়ালী দাস

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

কবিতা

নিবেদন

ছিন্ন করে দেবো আমার যত আছে বাঁধন

সব নিরাশাকে করব আশায় পরিণত,

ভালোবাসা দিয়ে বাঁধব বাহুডোরে

বাঁধব তোমায় বাঁধব অবিরত-

জন্মেছি আমি মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়ে

জানতে পেরেছি মৃত্যু বিভীষিকাময়,

আমি আছি তোমারই পথ চেয়ে

তোমার দেখানো পথেই করব মৃত্যুজয়।

সারাদিন আমার কাটে তোমার সঙ্গে

দিনযাপনের বন্ধু যে তুমি আমার,

তোমার লেখাতেই পেয়েছি নিজেকে খুঁজে

আমি ভালোবেসেছি তোমাকে আরো অসংখ্যবার-

নতুন প্রভাতের সূর্য তুমি আমার

জ্যোৎস্নারাতে তারার মতোই থেকো,

কুহক নিখিলের সঙ্গীহীন রাতে

বন্ধু তুমি আমার হাতটি ধরে রেখো।

অমিশা ভাওয়াল

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

হে কবিগুরু

তোমার ইচ্ছেকে সম্মান জানাতে গিয়ে

যখন আমার ইচ্ছেরা অনাথ শিশুর মতো

দিশাহীন ভাবে পথে পথে ঘোরে,

চাওয়া পাওয়ার হিসেব কষতে গিয়ে

যখন আমার যাযাবর ভাবনারা পথ হারায়

দিকভ্রান্ত মরু পথিকের মতো

তখনই আমি একান্তে খুলে বসি 'সোনার তরী'

আর মৃদু স্বরে মুঠোফোনে চালিয়ে দিই

'আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে.....'

আমার ভারাক্রান্ত মনটা হয়ে যায়

বৃষ্টি পরবর্তী আকাশের মতো নির্মল স্বচ্ছ

যেখানে থাকে না আর সিঁদুরে মেঘ।

যখন আমার অবোধ ভালোলাগাগুলো

আত্মম্ভরিতার পদতলে ছটফট করে,

যখন আমার নিষ্কলুষ ভালোবাসা

অশীতিপর বৃদ্ধার মতো

অবহেলা অপমানের ভার

বইতে আর সক্ষম হয় না,

তখনই নিভৃত ক্ষণে খুলে বসি 'গীতাঞ্জলি।'

দুঃস্বপ্নের অন্তিম ক্ষণ হতে শুরু হয় ফের

অজ্ঞাত স্বপ্ন পূরণের অভিলাষ,

চোরা অশ্রু বিচ্ছুরিত হয় মুক্তোর মতো।

বাস্তবের যে রুক্ষ ভূমিতে ফুটিয়েছো তুমি ফুল

অমর সৃষ্টির অমৃতলোকে

তার করুণা ধারায় অবগাহনে পায় অপার্থিব সুখ

অনুপ্রাণিত হই আগামীর রূপরেখা নির্মাণে,

তুমিই যে নৈরাশ্য পীড়িত ধরায় একমাত্র কল্পতরু।

তোমার থেকেই মানব বোধের উপাসনার উপকরণ হয় প্রাপ্তি,

তোমার অতিকায় সৃষ্টি সম্ভারে খুঁজে পায়

আত্মার প্রশান্তি আর মনের হরষ।

হে কবিগুরু! আমার হৃদয় পিঞ্জরে সদা অনুরণিত হয়-

'আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ .....

পিয়ালী দাস

পঞ্চম সেমিস্টার(তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

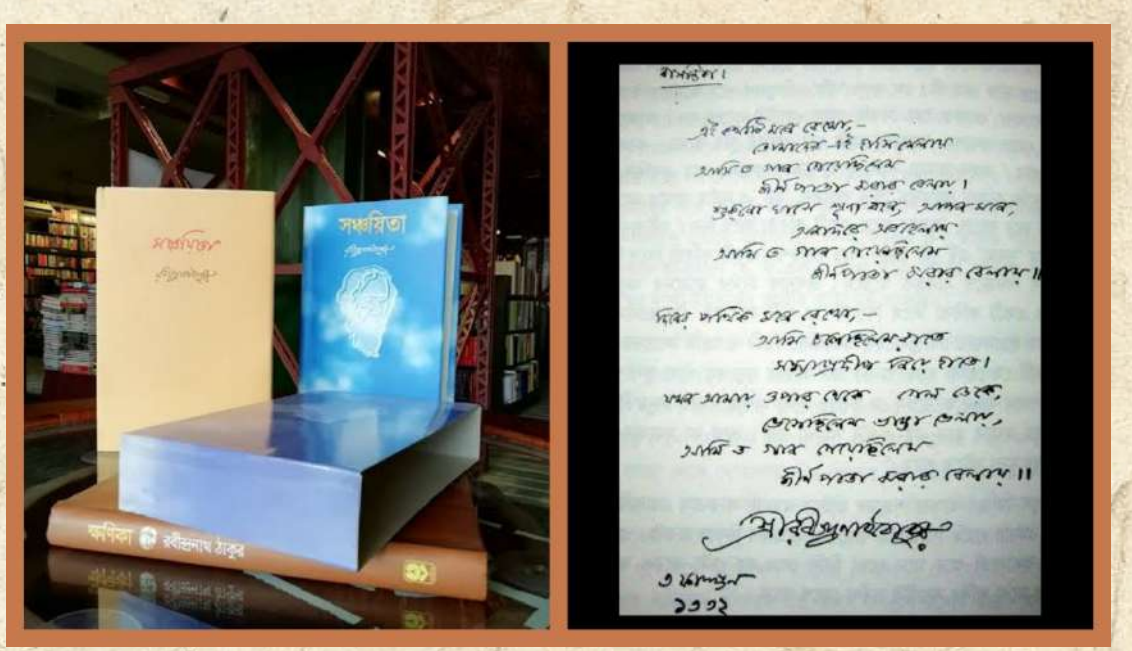

অনুকবিতা

শুধুই রবি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই দেশেরই ছেলে,

গীতাঞ্জলি লিখে তুমি নোবেল প্রাইজ পেলে।

এই দেশেতেই জন্ম তোমার,

মরণ তোমার এই বুকে।

তোমার ভাষায় গান গেয়ে,

মানব মন ওঠে জেগে।

গায়ক তুমি ভাষক তুমি,

মানব জীবনের নায়কও তুমি।

তাই তো বলি বারে বারে,

তোমায় পেয়ে ধন্য এই পৃথিবী।।

তৃষা চক্রবর্তী

পঞ্চম সেমিস্টার(তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

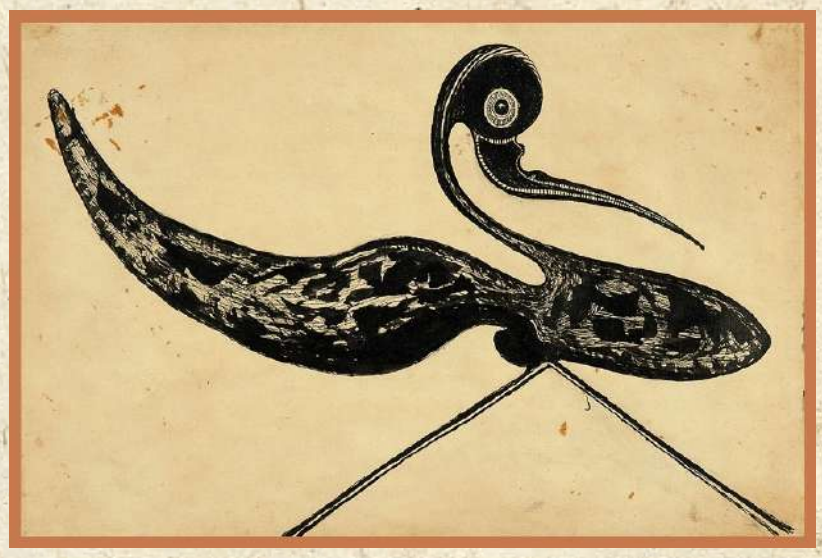

কবিতুমি

অচলায়তনের গুরু তুমি,

শান্তিনিকেতনের ঠাকুর তুমি

কলকাতার রবি তুমি,

বিশ্ব মাঝারে ধরা তুমি।

রবির মত দ্বীপ্ত তুমি ,

গীতাঞ্জলির স্রষ্টা তুমি

ঠাকুরবাড়ির রবি তুমি,

সাহিত্য জগতের বিশ্বকবি তুমি ।

পৃথা সেন

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

দুই প্রিয়

প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জলরাশি

আমার এখনও দেখা হয়নি ,

তাই মাপাও হয়নি তার গভীরতাটা ।

কিন্ত আমি দুজন মানুষকে দেখেছি

তাদের হৃদয় এতটাই গভীর যে ,

আমি তাদের হৃদয়ের গভীরতায় যেভাবে ইচ্ছা

বিচরণ করতে পারি ।

ঠিক সামুদ্রিক প্রাণীকুলের মতো।

আলিশা নাসরিন

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

আমিও পেয়েছি

আমিও সমুদ্রের ডাক শুনেছি ,

আমিও কোকিলের ডাক শুনেছি ;

আমিও মানুষ চিনতে শিখেছি ।

আমিও প্রেমে পড়তে শিখেছি

আমিও প্রেমের সংজ্ঞা খুঁজে পেয়েছি ,

আমিও প্রকৃতির সংজ্ঞা খুঁজে পেয়েছি ।

পৃথা সেন

তৃতীয় সেমিস্টার(দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

খোলাচিঠি

শ্রীচরণেষু মা,

১০ মাস গর্ভে লালিত হওয়ার পর যার জন্য প্রথম এই ধরিত্রীর বুকে শ্বাস নিতে পেরেছি সেই ছোট্ট গভীর শব্দটি হলো "মা"।

মা কে নিয়ে কখনও চিঠি লিখবো ভাবিনি বা মা-কে নিয়ে নিজের উপলব্ধি ভালোবাসা প্রকাশ করার কথাও কখনও ভাবিনি। মুখে বলতে পারবোনা তাই প্রথম দিনের পর জ্ঞান হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত তোমায় নিয়ে কিছু অনুভূতিই তোমাকে চিঠির মাধ্যমে জানাচ্ছি।

তুমি তো আমার সেই মা,

যে জ্বরে রাত জেগে জলপট্টি দিত।

তুমি তো আমার সেই জন,

যে প্রিয় খাবারটা মুখ ফুটে বলার আগেই করে হাজির করতো।

তুমি তো আমার সেই শক্তি,

যখন তোমার সন্তান হয়েও ধৈর্য্য হারিয়ে ফেললেও তুমি উৎসাহ দিয়েছো, শক্তি জুগিয়েছো।

তুমি তো আমার সেই ভরসা,

যার অভিধানে পারবোনা বলে কোনো শব্দ নেই।

যার অভিধানে চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই, ধৈর্যের ক্ষমতা রাখতে হয়, ঠাণ্ডা মাথায় ভরসা করতে হয়।

তুমি তো আমার সেই বন্ধুও,

যার সাথে কারণে অকারণে ঝগড়া- তর্ক- বিবাদ।

তবে তুমি সেই রক্ষী,

যেন ঝড়ের মধ্যে আগলে রাখা সখী।

তুমি আমার সেই মানুষ,

দিনের শুরুতে চোখ খুলে যাকে দেখে ফেরে হুঁশ।

শেষে তুমি হলে আমার ছাতা, মা অন্নপূর্ণা আবার সুখে বা দুঃখে আগলে রাখা মাতা।

তোমার প্রতি আমার অনুভূতি অনেক পরে এসেছে। এর জন্য তোমার অনেক খারাপ লাগা থাকলেও তুমি দূরে ঠেলে কখনও দাওনি কিন্তু অনেক সময় হয়েছে আমি খারাপ ব্যবহার করে ফেলি। এর জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী মা তোমার কাছে। তবুও বলবো তোমার ওপর রাগ দেখাবোই কারণ সেটা ছাড়া পুরো দিন অসম্পূর্ণ, আমরা অসম্পূর্ণ। তবে যে যাই বলুক হাজার কষ্ট বুকে নিয়েও সয়ে যাওয়া আমার চোখে শ্রেষ্ঠ "মা"তুমি। এই তোমার মেয়ে তো কিছুই দিতে পারলনা তাই চিঠির মাধ্যমে জানাই প্রণাম আর এক গুচ্ছ ভালোবাসা, আদর। তোমার

অনেক সুস্থতা কামনা করি মা।

-ইতি

তোমার আদরের মানি

তৃষা চক্রবর্তী

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

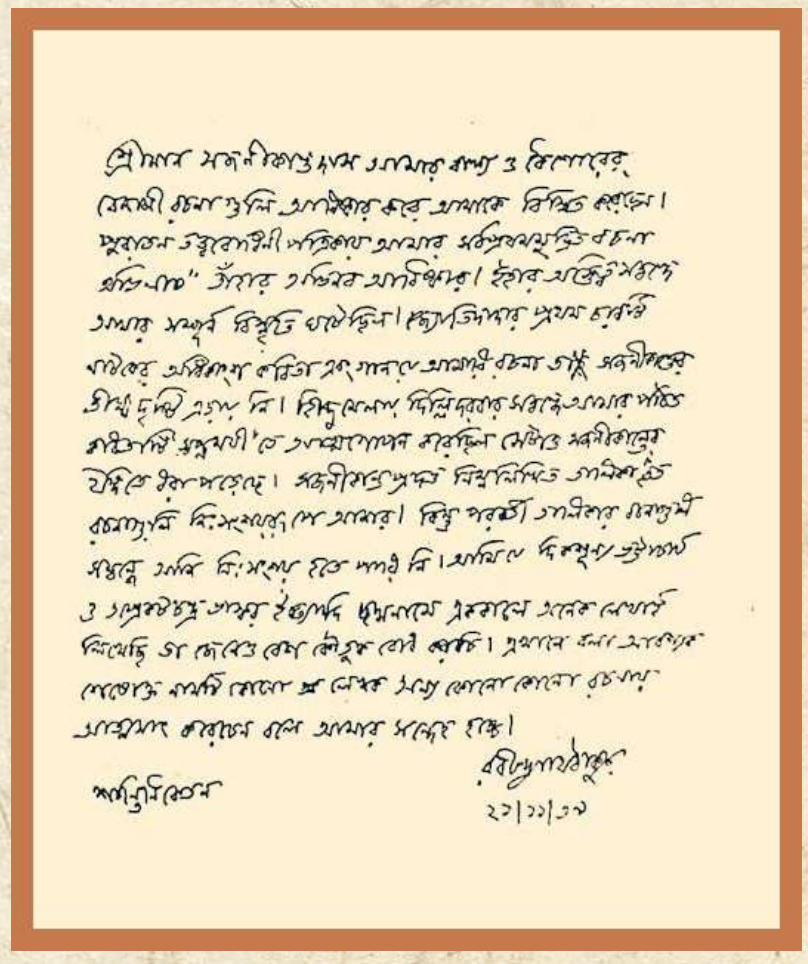

শান্তিনিকেতন
ও
ভ্রমণ সাহিত্য

রবির দেশে

করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউনের ফলে ২ বছর প্রায় ঘরেই বন্দী থাকি আমরা সকলে। প্রায় ২ বছর পর আবার যখন সব স্বাভাবিক ছন্দে ফিরলো ঠিক তখনই আমরা বাংলা বিভাগের ছাত্রীরা সব অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের কাছে একপ্রকার অনুরোধ করে বসি যে এবার আমাদের কে ঘুরতে নিয়ে যেতে হবে। বিষয় যখন বাংলা তখন রবীন্দ্রনাথ তো প্রসঙ্গ থাকবেই তাই দিন ১৫ এর মধ্যেই ঠিক হলো শান্তিনিকেতন যাওয়া হবে। মাঝের এই ১৫ দিন আমাদের সবার প্রস্তুতি পর্ব চললো ও সাথে চললো প্রহর গোনা এবং অবশেষে এলো সেই দিন।

যথারীতি ৮ই এপ্রিল সময়মতো তৈরি হয়ে নিজের ব্যাগ গুছিয়ে বাবা - মায়ের থেকে বিদায় নিয়ে (যেহেতু তারা স্টেশন এ ছাড়তে আসতে পারেনি) গন্তব্য হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম বাড়ি থেকে। পৌঁছেও গেলাম সময়মতো। সবাই আসার পর সব - অধ্যক্ষা ও সব ছাত্রীরা মিলে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে উঠে পড়লাম। আমাদের জায়গা আগে থেকেই সংরক্ষণ করা ছিল তাই কোনো অসুবিধা হয়নি। তারপর সবাই সবার বাড়ির অভিভাবকদের থেকে বিদায় নিয়ে নিল এবং ঠিক ১০:১০ এর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ছেড়ে দিলো আমাদের গন্তব্য শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে।

চারপাশে মাঠ, রাস্তা, গাছ, মানুষকে পেছনে ফেলে ট্রেন ছুটে চলেছে। ঠিক ১২:২৫ নাগাদ আমরা নেমে পড়লাম রবিঠাকুরের স্থান শান্তিনিকেতনে। সেখানে সব দাপ্তরিক কাজ করে আমরা সবাই টোটোতে করে যুব আবাসে এলাম, যেখানে এই তিন দিন আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। ঘর ঠিক করে যে যার ঘরে গিয়ে স্নান সেরে যে যার মতো খেতে চলে গেলাম। সেখানে ঠিক হলো খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আমরা আশেপাশের কিছু জায়গা ঘুরে দেখবো আজ। সেই মত আমরাও খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে তৈরি হয়ে নিচে চলে এলাম। টোটো করে আমাদের বিকেলের যাত্রা শুরু হলো।

বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্যে এগোলাম প্রথম দিন। যেহেতু এই পরিস্থিতিতে বিশ্বভারতী বন্ধ তাই বাইরে থেকেই দর্শন করলাম। তারপর সেখান থেকে এক বন্ধুর মারফত আমরা কলাভবনে ঢুকতে পারলাম। পাশে সঙ্গীত ভবনও দেখলাম। প্রতিটি জায়গার ইতিহাসগুলো খুব সুন্দর করে প্রত্যেক স্যার ম্যাডামরাই ব্যাখ্যা করে দিচ্ছিলেন যা আমরা মুগ্ধতার সাথে শুনছিলাম ও সেই সময়কালকে কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম। ডায়েরিতে যে যার মতো নোট করেও রাখছিলাম কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অমূল্য তথ্য।

সঙ্গীত ভবনে এক সুন্দর নৃত্যানুষ্ঠান দেখলাম যা ভাষায় সত্যিই বর্ণনা করা যায় না, একমাএ উপলব্ধিতে তার স্বাদ আস্বাদন করা যায়। তারপর একে একে কালোবাড়ী, অমর্ত্য সেনের ছোটবেলার বাড়ি, ছাতিমতলা, উপাসনা গৃহ, বটবৃক্ষ যেখানে ঠাকুরের পাঠশালা ছিল, ঠাকুরের আশ্রম দেখলাম। তারপর আরেকটু এগিয়ে গিয়ে কোপাই নদীতে সবাই মিলে নামলাম। এইরকম গরমের আবহাওয়ায় কোপাই নদীর জল ও পরিবেশ এক অন্যরকম অনুভূতির সৃষ্টি করলো। তারপরে খোয়াই হাটে একটু ঘোরাঘুরি , পাশে একটা শ্মশান পড়েছিল বটে তবে আমরা কেউ যাইনি আর সেখানে। স্যার ম্যাডামরা আমাদের জন্য মাঝে এরইমধ্যে আইসক্রিম, চা-এর ব্যবস্থা। গরমে এই আয়োজনটা সত্যি ঘুরতে কিছুটা শক্তি জোগায়।

সন্ধ্যে নেমে আসছিল আর সব হাটের মানুষরা এবার ফিরতি পথের জন্য তৈরি হতে থাকলো। আমরাও আর বেশি দেরি না করে হোস্টেলের দিকে পা বাড়ালাম। সব স্থান গুলোই এক কথায় অসাধারণ। এইটুকু পরিসরে যার ব্যাখ্যা অসম্ভব। ফেরার পথে একটি গ্রন্থাগারে কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে বইয়ের পাতায় কিছুটা চোখ বুলিয়ে নিলাম, একটু নতুন বইয়ের গন্ধটা উপলদ্ধি করার চেষ্টা করলাম আর যে বই গুলো পছন্দ হলো টপাটপ মুঠোফোনের বোতাম টিপে কয়েকটা ছবি তুলে রাখলাম কলকাতায় ফিরে সন্ধান করবো যে।

আমি কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে স্যার এর থেকে শুনে রাতের অন্ধকারে উপাসনা গৃহ, বটবৃক্ষের স্থানে। সেই স্থান রাতের আলোয় যেন ঝলমল করে উঠেছে এক নতুন রূপে। তারপর আবার আমরা যুব আবাসে ফিরে আসি। এসেই একটা

চমক । এখানে এসে শান্তিনিকেতনের সান্ধ্য জলখাবার চিকেন মোমো । সন্ধ্যেটা পুরোই সেই স্বাদে জমে তারপর গল্প কথাবার্তা চলার পর রাত নটার মধ্যে খেয়ে শুয়ে পড়লাম কারণ পরের দিন সকাল ৮ - ৮:৩০ টার মধ্যে বেরোতে হবে । সেই মত সবাই খেয়ে যে যার মতো ঘরে চলে গেলাম । তবে আমরা এক একটা ঘরে চারজন করে ছিলাম আর আমি ছিলাম বাকি তিন সিনিয়র দিদিদের । যাই হোক ঘুমতো আর তেমন হলোনা কাল কোথায় কোথায় যাবো এই ভেবেই সারারাত কাটালাম ।

সকালের আলো ফুটতেই তৈরি হয়ে নিলাম । স্নান সেরে সেজে নিচে চলে গেলাম । সকালের প্রাতঃরাশ করে তারপর গাড়ি করে প্রথমে যাওয়া হলো কঙ্কালীতলা মন্দির । মাকে দর্শন করে সাঁওতালি আদিবাসীদের সাথে নাচের একটু সুযোগ হয়ে গেলো স্যার ম্যাডামদের জন্য । ওনারাও আমাদেরকে উৎসাহ দেন । এরপর গেলাম ফুল্লোরা মন্দির। তারপর সেখান থেকে লাভপুর যাই " ধাত্রীদেবতা " তে অর্থাৎ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি যাই । সেখানে কিছুক্ষণ কাটাই । ওনার বাড়ির চারপাশ , সংরক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখি । একটু হেঁটে আঁতুড় ঘর , দূর্গামন্দির দর্শন করি । এরপর আমরা গাড়ি করে বনবিথির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে । এটা একরকমের অপ্রত্যাশিত বলা যেতেই পারে । কারন এই ব্যাপারে অবগত ছিলাম না । স্যার ম্যাডামরা আমাদের জন্য এটাও একপ্রকার চমক রেখেছিলেন । আমরা সকলেই খুব খুশি বনবিথিতে গিয়ে এবং চারপাশের পরিবেশ আরো মুগ্ধ করেছিল আমাদের ।

সেখানকার খাওয়ার আয়োজনও এক কথায় অসাধারণ । তারপর সেখান থেকে বেড়িয়ে " আমার কুটির " -এ বিভিন্ন রকম হাতের কাজের জিনিস ঘুরে ঘুরে দেখলাম , পছন্দমত কিনলামও টুকটাক । এরপর আমরা সেখান থেকে সব থেকে কাঙ্খিত স্থান সোনাঝুড়ির হাটে গেলাম । প্রায় ২ ঘণ্টা আমরা সকলেই নিজেদের মনের মত করে কেনাকাটা করেছি । এবার ফেরার পালা এবং ২ দিনের সফর এখানেই এই হাটেই সমাপ্তি ঘটাতে । সবাই তবে আনন্দ করে হোস্টেলে ফিরে আসলাম ও এখানকার নিয়মমতো রাতের জন্য তৈরি হয়ে ৯ টার মধ্যে সকলে খেয়ে শুয়ে পড়লাম কারণ একরাশ মন খারাপ কারণ ভোর হলেই বিদায় জানাতে হবে এই স্নিগ্ধ সুন্দর স্থানকে ।

পরের দিন অর্থাৎ ১০ ই এপ্রিল সকাল সকাল তৈরি হয়ে ব্যাগ গুছিয়ে নিচে নেমে । এবার ফেরার পালা । আবার টোটো করে স্টেশন গেলাম এবং মালদা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে সবাই উঠে পড়লাম । ট্রেনে সকালের প্রাতঃরাশ সারলাম ।

একরাশ মন খারাপকে সঙ্গী করে ফিরে । সাথে নিয়ে গেলাম অনেক না জানা তথ্য , অনেকটা স্মৃতি যা অনেকদিন পাথেয় হয়ে থাকবে , মনখারাপের দিনকে তরতাজা করে রাখবে , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আরো অনেকটা উপলদ্ধি করার চেষ্টায় রইলাম এবং কথা দিলাম আবারও খুব তাড়াতাড়ি সাক্ষাৎ হবে তোমাদের সাথে ।

এবং এই এত সুন্দর একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ উপহার দেওয়ার জন্য আমি সত্যি প্রত্যেক অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের কাছে । ওনাদের ব্যবস্থাপনা না থাকলে কখনোই এত সুন্দর এই ৩ দিনের সফর সম্ভব হতনা ।

সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।।

ভালো থেকো সবাই, ভালো থেকো শান্তিনিকেতন।।

তৃষা চক্রবর্তী

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

শান্তিনিকেতন স্মৃতিচারণ

০৮.০৪.২০২২

কু ঝিকঝিক ঝিকঝিক করতে করতে এসে পৌঁছেছিলাম শান্তির স্থলে শান্তিনিকেতনে। ভেবেছিলাম এখানে পা দিতেই রবি ঠাকুরের স্পর্শ পাবো। কিন্তু কেন জানিনা। সেই স্পর্শ পাইনি প্রথমে। তবে যত গভীরে গেছি তত পেয়েছি তাঁর ছোঁয়া। তাঁর গন্ধ, তাঁর স্পন্দন।

আমরা যে ঘরটায় ছিলাম। সেই ঘরটা স্বয়ং রবি ঠাকুরই মনে হয় আমার জন্য ঠিক করে রেখেছিলেন। কারণ বড়ো জানলাটা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল এক সুদূর সবুজ প্রান্তর। চারিদিকে বড়ো বড়ো গাছের সারি যেন আগলে রেখেছে সেই মাঠটাকে। একটা শান্তির নিশ্বাস নিতে পেরেছিলাম ওই জানলার ধারে দাঁড়িয়ে।

সেদিন বিকেলেই, ঠিক বিকেলে নয়, সূর্য যখন ক্লান্ত হয়ে এসেছে, তার ঘুমোতে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বেরিয়ে পড়েছিলাম শান্তিনিকেতন চত্বরে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে যদিও সেই গরুর গাড়ি বা ঘোড়ার গাড়ি ছিলনা, চার পায়া টোটোয় করে ধীরে ধীরে যেতে যেতে দেখেছিলাম সেই রঙিন কাঁচে ঢাকা উপাসনা ঘর, তারপর সেই ছাতিম তলা, তিন থাক বট বৃক্ষের আস্তানা, আর তারপরই সেই প্রিয় বিশ্ব ভারতী কলাভবন। সেখানে উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে ছড়িয়ে ছিল রামকিঙ্কর বেইজের শিল্পের নানান স্পর্শ, নন্দলাল বসুর আঁকিবুঁকি ঘর। আর কলাভবনের সেই ছাত্রছাত্রীদের অসামান্য হাতের কাজ। কাঠের ওপর,মাটির ওপর,চামড়ার ওপর,কাপড়ের ওপর বিভিন্ন প্রকার হাতের কাজ। যা এক ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের সৃষ্টি করেছে। আর কলাভবনের সমস্ত চত্বর জুড়ে ছিল অপরূপ কিছু আঁকা, দেওয়াল চিত্র যা দেখে মন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কলাভবনের খানিক ভেতরে যেতেই চোখে পড়ে বেশ কয়েকজন ছেলে মেয়ে গানের তালে তালে গোল হয়ে নেচে যাচ্ছে...“ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল লাগল যে দোল..” এক দৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল আমিও যদি ওদের অংশ হতে পারতাম!

সময় বেশি ছিল না হাতে। সুয্যি মামা এবার ঘুমিয়ে পড়বে পড়বে করছে। তাই আর দেরি না করে রওনা দিয়েছিলাম কোপাই নদীর উদ্দেশ্যে।

আর সেখানে পৌঁছতেই এক অসীম শান্তি অনুভব করলাম। ছুটটে চলে গেছিলাম নদীর পাড়ে। জল খুব বেশি ছিল না, সেই জলেই বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি গড়ে উঠেছিল, চারিদিকে এক হালকা হাওয়া, জলটা কেমন কুচি কুচি স্রোতে এক দিকে বয়ে যাচ্ছে। আর আমি এক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে যাচ্ছিলাম সেই হাওয়া আর জলের খেলা। কানে আসছিল বাউলের গান। আলাদাই এক আনন্দ হচ্ছিল মনে। এই কি তবে শান্তিনিকেতন এর আসল শান্তির স্থল!

কোপাই নদীরতীর থেকে ফিরেই শেষ হয়েছিল সেদিনের সফর। এবার পরের দিনের অপেক্ষা।..

০৯.০৪.২০২২

আজ সাতসকালে রওনা দিয়েছিলাম, সুদূরের উদ্দেশ্যে। বোলপুর ছাড়িয়ে গেছি লাভপুর। হাশুলিবাঁকের উপকথা-র সৃষ্টিকর্তা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় - এর বাড়ি। মাঝে পড়েছে কঙ্কালীতলা র মন্দির। নেচেছিলাম এক ভিন্ন গানে, ভিন্ন তালে। তারপর গেছি দেবী ফুল্লরার মন্দির। আর তারপর সেই লাভপুর। আর সবথেকে আশ্চর্য আর স্মরণীয় ঘটনা যা ঘটেছিল, তা কোনোদিনও ভুলবোনা। তারাশঙ্কর মহাশয়ের এক ঘনিষ্ঠ

আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে আমাদের। কত কি জেনেছিলাম তাঁর শৈশব, কৈশোর আর যৌবনকালের সম্পর্কে। আলাদা অভিজ্ঞতা হলো সেখানে গিয়ে। এখান থেকে রওনা দিয়েছিলাম বনবিথি। খেয়েছি অপূর্ব। আর সবশেষে সেই বহু আকাঙ্খিত সোনাঝুড়ির হাট। কত যে রকমারি জিনিস তা বলে বোঝানোর হয়। নিজেকে সাজানোর জিনিস,ঘর সাজানোর জিনিস, কাউকে উপহার করার রকমারি দ্রব্য, কতরকমের জামা কাপড়, চারিদিক শুধু রঙিন আর রঙিন। একলা হেঁটে হেঁটে দেখেছি সব। হ্যাঁ খানিক জিনিস আমিও কিনেছি। তবে কেনার থেকে একসাথে এতগুলো জিনিস দেখে বেশি আনন্দ পেয়েছি। আর এসবের মাঝেও মজার ছিল সেই বোলপুরের গানের তাল সাথে মিষ্টি দই। আহা! সেই বিকেল আলাদাই এক আনন্দ দিয়েছিল মনে।..

১০.০৪.২০২২

এবার ফেরার পালা। এই প্রাণের প্রিয় জায়গা ছেড়ে ট্রেনে করে আবার চললাম সেই কংক্রিটের শহরের উদ্দেশ্যে। শান্তিনিকেতনের শান্তি টুকু মনে আগলে নিয়ে এসেছিলাম। আবার একদিন ফিরে যাবো , শান্তির খোঁজে....

প্রীতিষা মাইতি

(প্রাক্তনী)

বাংলা বিভাগ

আঁকিবুঁকি

শ্রেয়া ব্যাণার্জী

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

শ্রেয়া দে

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

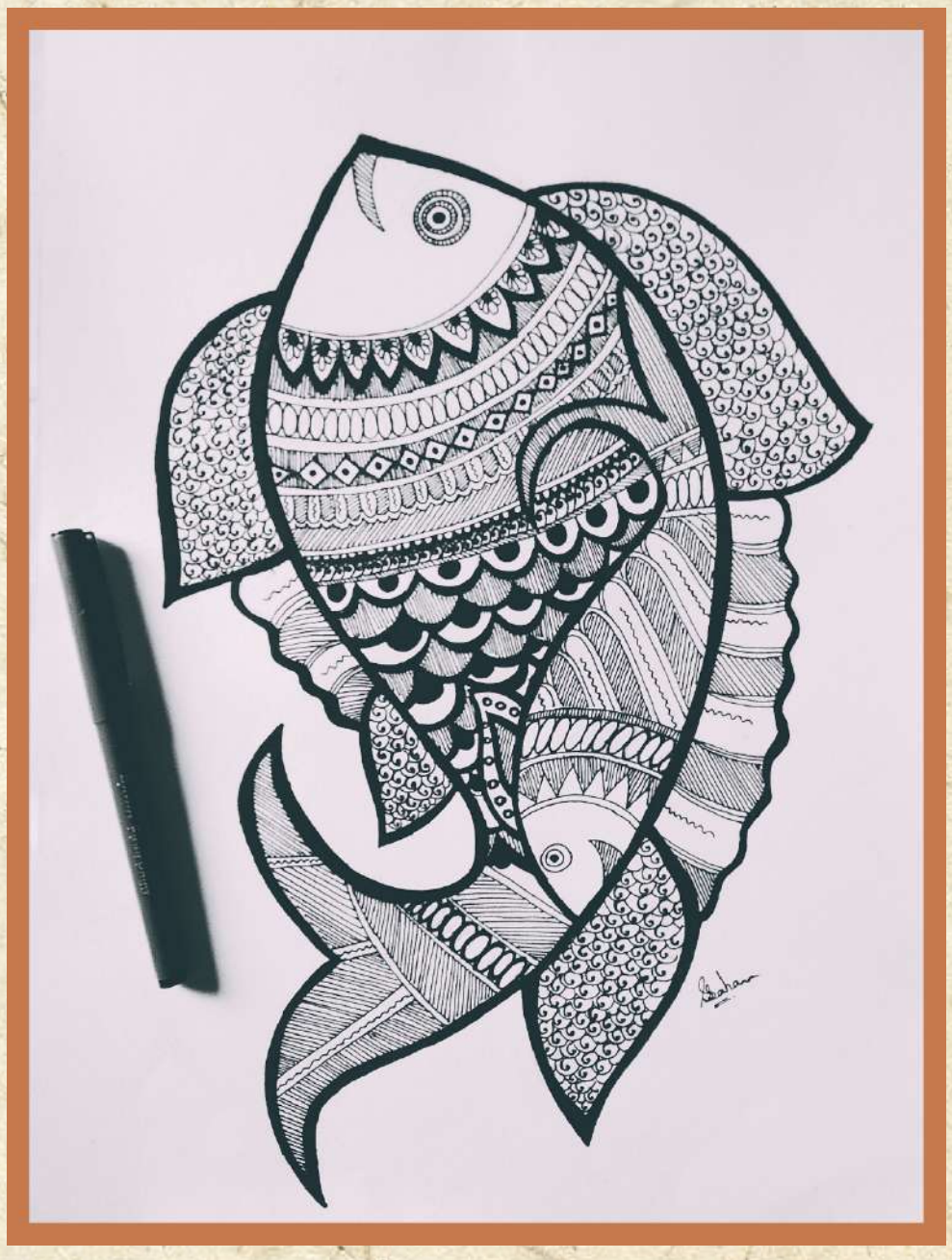

সাগরিকা সাহা

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

তৃষ্ণা চক্রবর্তী

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

সুলগ্না দে

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

ঐশী সিংহ

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

ফটোগ্রাফি

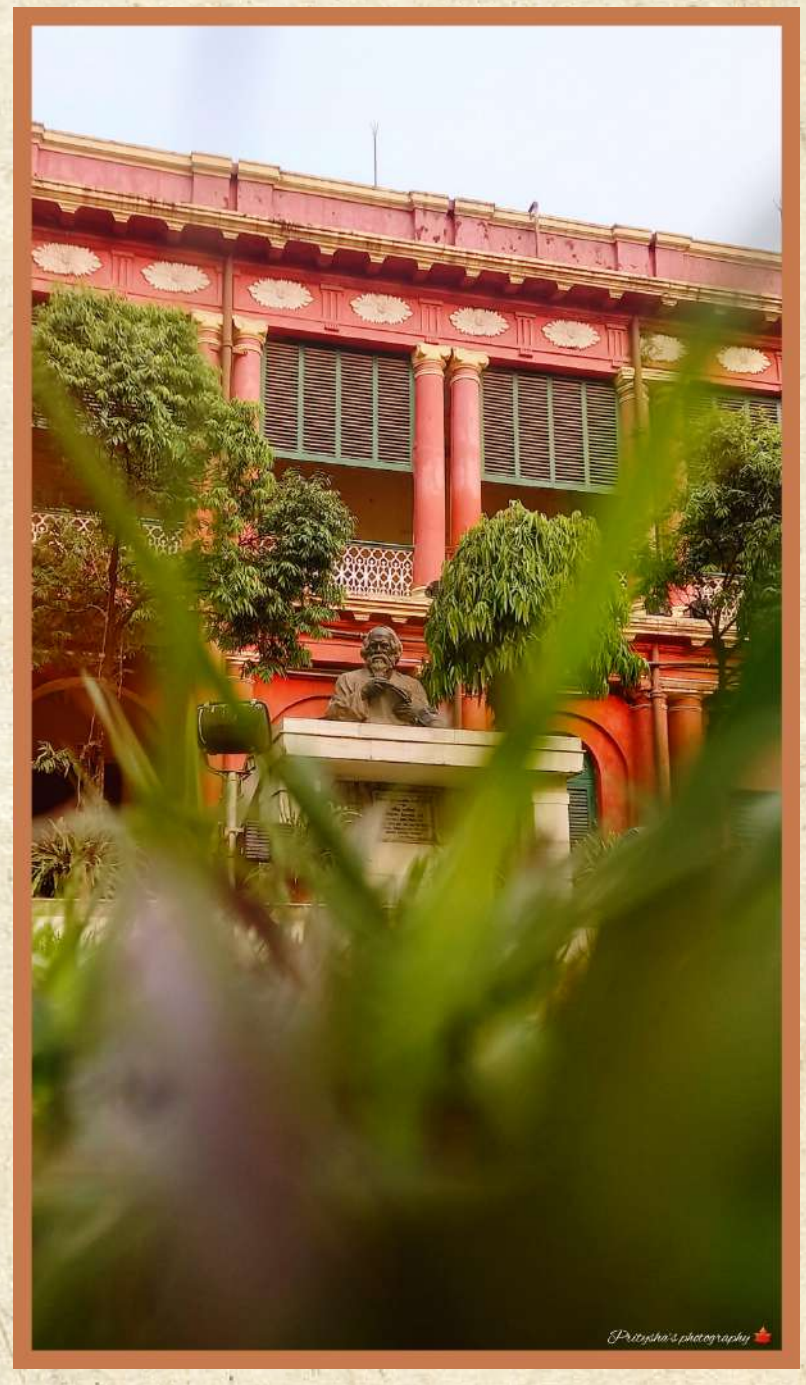

" জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি

আমার প্রিয় রবির বাড়ি। "

প্রীতিষা মাইতি

(প্রাক্তনী)

বাংলা বিভাগ

" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজরিত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি "

পূজা দাস

(প্রাক্তনী)

বাংলা বিভাগ

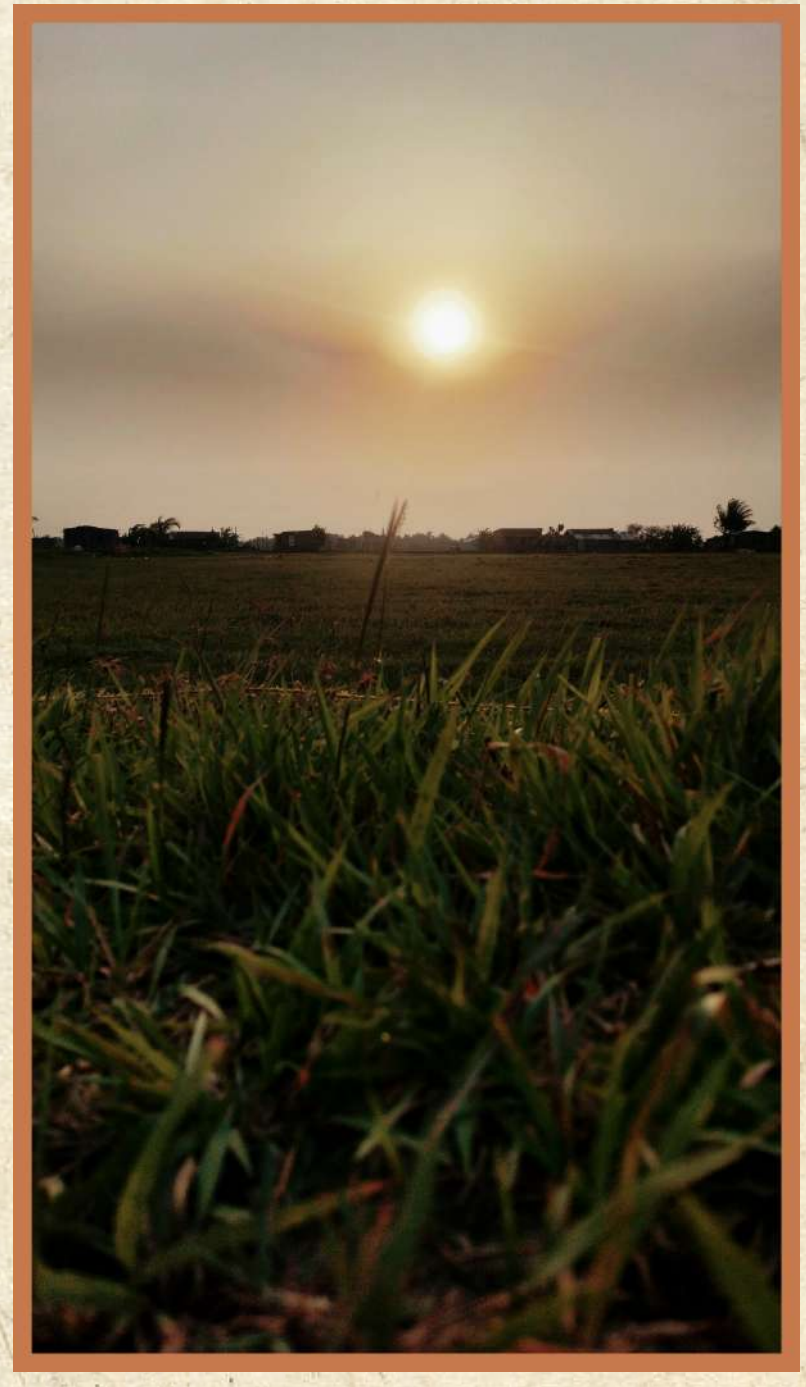

" দিগন্তরেখায় সীমাহীনতা "

অপর্না পাল

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

" সকলি নবীন যাহার কাছে, তাঁরই পাওনায় বারবার....

লহ প্রণাম ।"

পিয়ালী দাস

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

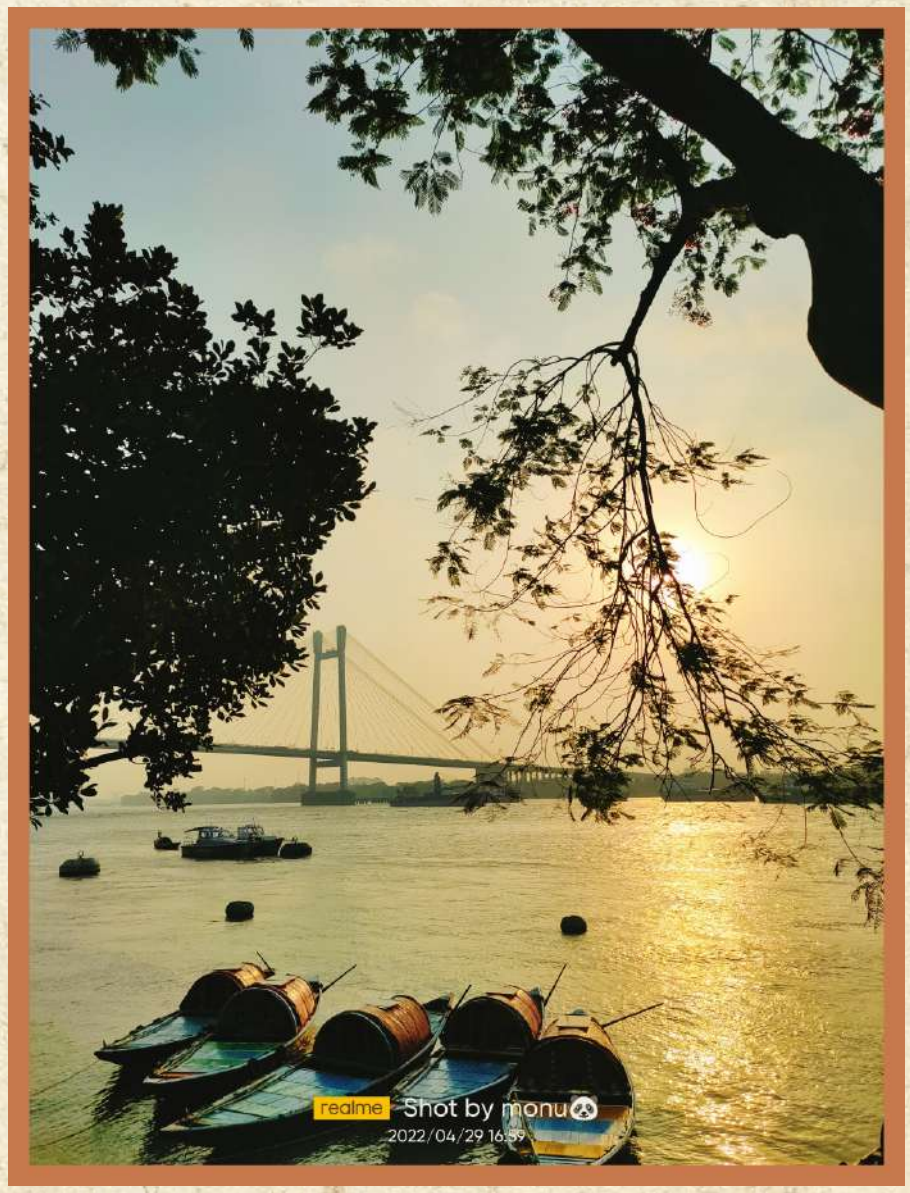

" করছে সন্ধি নদী , নৌকার সঙ্গে আজ ,

রোজ উঠছে জোয়ার - ভাঁটার ঢেউ , শরীরজুড়ে মনকেমনের সাজ । "

মন্দিরা বসাক

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

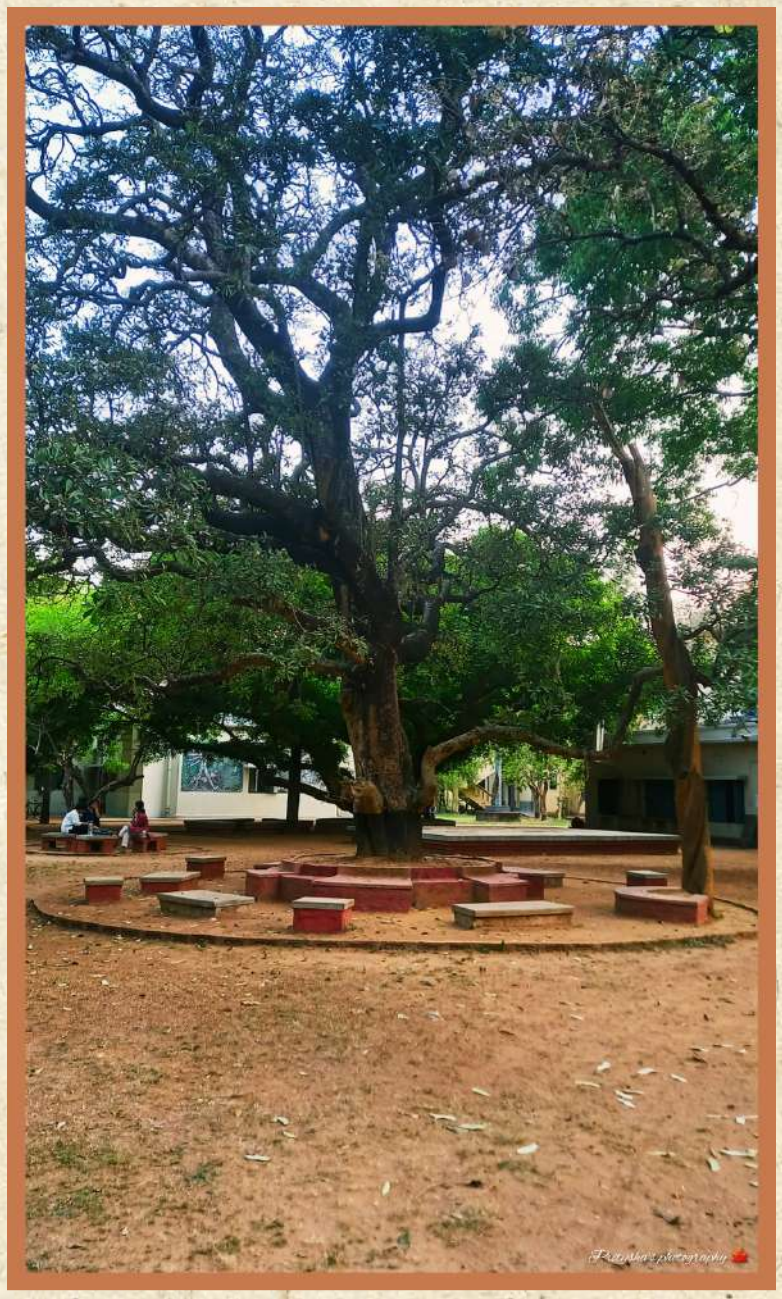

" হেথায় আছে তোমার কোমল কন্ঠস্বর,
স্পর্শ করি বৃক্ষ, চলে স্মৃতির রোমন্থন । "

প্রীতিষা মাইতি

(প্রাক্তনী)

বাংলা বিভাগ

" তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে

সব গাছ ছাড়িয়ে

উঁকি মারে আকাশে। "

আলিশা নাসরিন

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

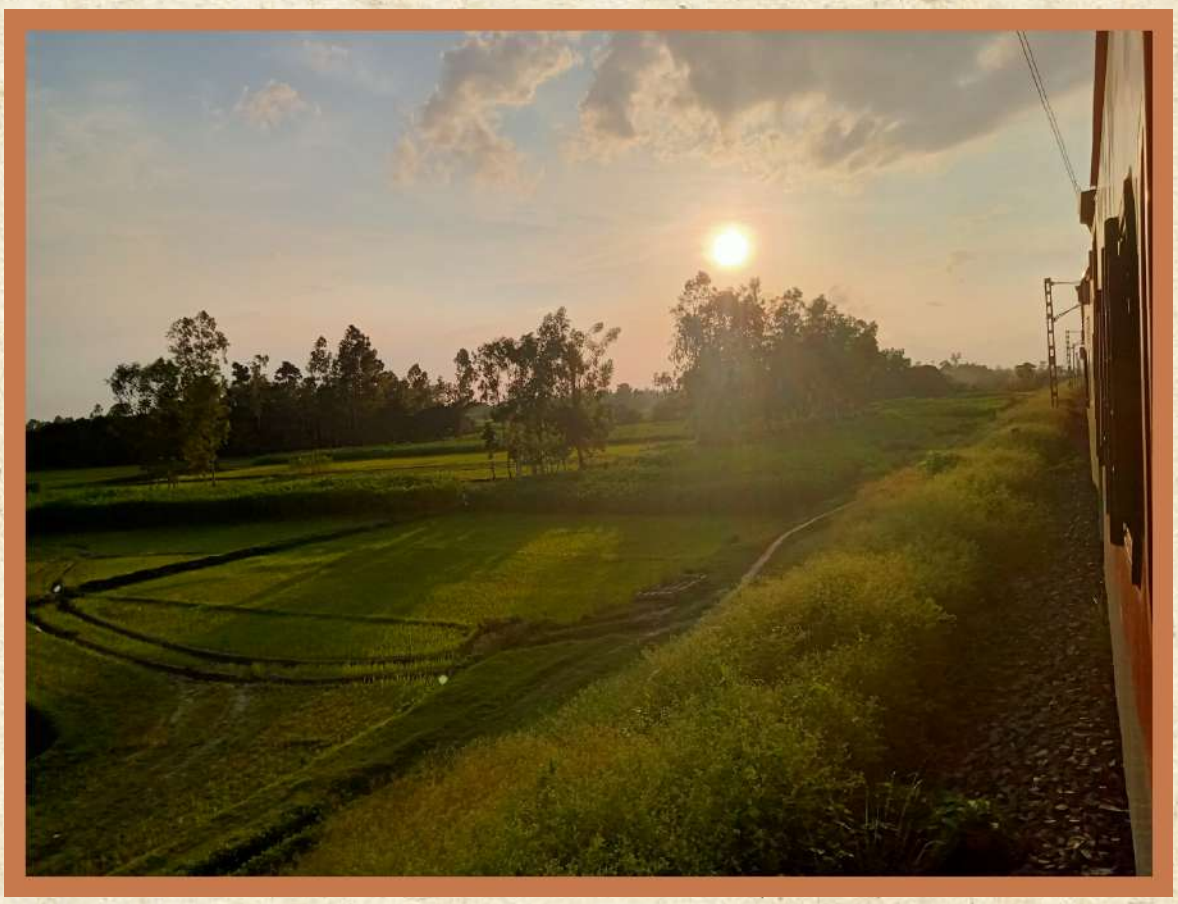

" পড়ন্ত বিকেলে সান্ধ্য স্নান "

হেতু বর্মন

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

" আশা হল সেই গাছ ,যা বিশ্বকে ধরে রাখে "

সাগরিকা সাহা

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

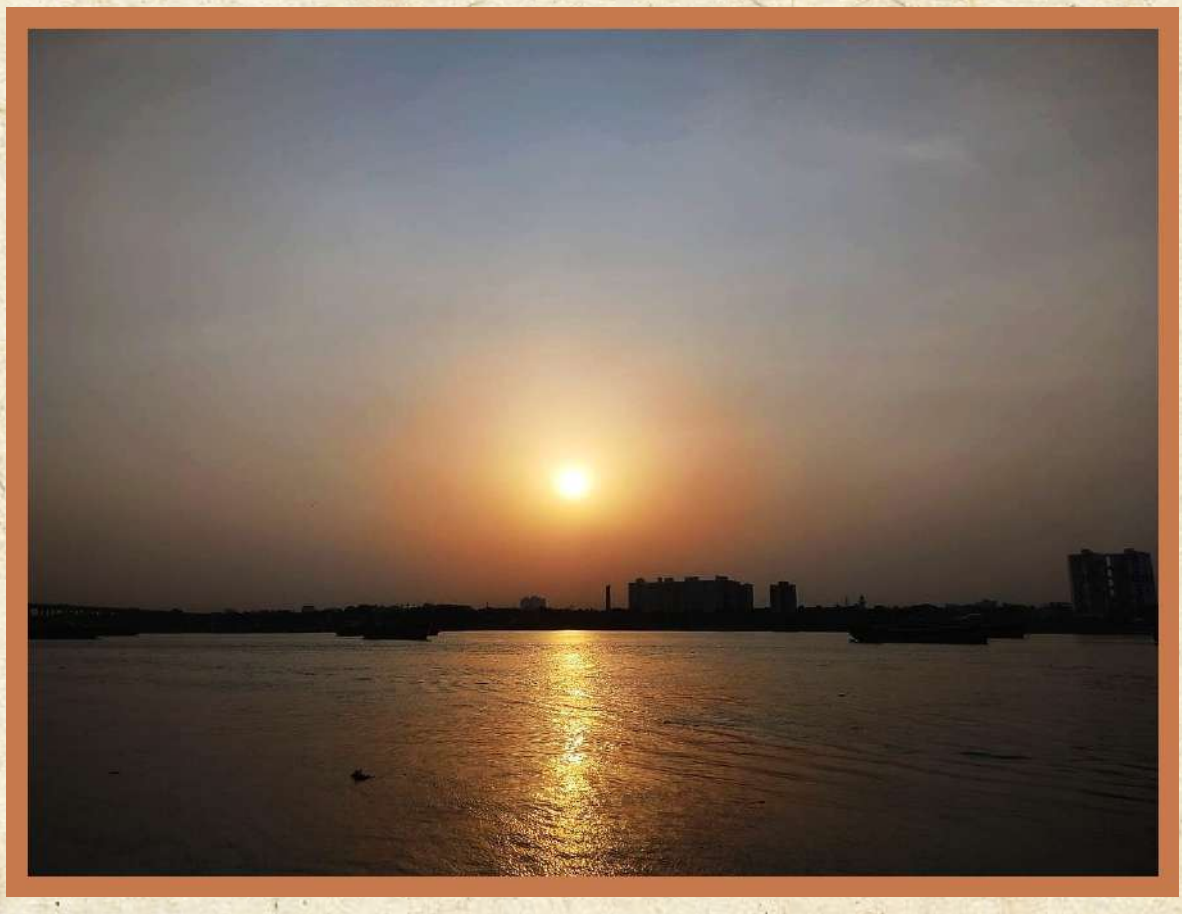

" বিকালের রোদ লালচে আভায়

মিলিয়ে যায় অস্তাচলে "

অঙ্কিতা বিশ্বাস

(প্রাক্তনী)

বাংলা বিভাগ

" ইটের তৈরী ইটের ইগলু "

মন্দিরা বসাক

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

" কোপাই নদীর জলে

ওরা ছবি এঁকে চলে। "

প্রীতিষা মাইতি

(প্রাক্তনী)

বাংলা বিভাগ

" এই যে কালো মাটির বাসা শ্যামল সুখের ধরা । "

হেতু বর্মন

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

" কলাভবনের দেওয়াল ছবি "

সাগরিকা সাহা

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

" তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহা
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার। "

শর্মিতা দত্ত

(প্রাক্তনী)

বাংলা বিভাগ

সমাপ্ত